উন্নয়ন পরিকল্পনা
Development Planning

ইউনিট ১০

ভূমিকা

কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে একটি সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। একটি দেশের উন্নয়ন করতে গেলে প্রয়োজন একটি সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। আর এইসব প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয় তবে দেখা যায় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে। বাংলাদেশে একটি LDC আওতাভুক্ত দেশ হিসেবে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করছে। এছাড়া এদেশে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। এই ইউনিট থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারনা ও ব্যাখ্যা জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১০.১: উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারনা

পাঠ ১০.২: উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা

পাঠ ১০.৩: বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

পাঠ ১০.৪: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন-২০২১

পাঠ ১০.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারনা
Concept of Development Planning

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সময়ের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

উন্নয়ন পরিকল্পনা সংজ্ঞা

উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে একটি দেশের বা অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে পরিকল্পত কর্মসূচী গ্রহণ করাকেই বুঝায়। বর্তমান যুগ উন্নয়নের যুগ এবং পরিকল্পনার যুগ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কয়েকজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদদের দেয়া উন্নয়ন পরিকল্পনার সংজ্ঞা বিবেচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে সংজ্ঞাগুলো দেওয়া হল।

অধ্যাপক রবিনসন এর মতে, পরিকল্পনার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা ও পছন্দ করা এবং এ পছন্দই হল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল বিষয়।

অধ্যাপক টিনবারজেন (Tinbergen) বলেন, পরিকল্পনা হল রাষ্ট্র দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবন সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের জন্য সযত্ন প্রস্তুতি।

অধ্যাপক ডালটন বলেন, ব্যাপক অর্থে ইস্পিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে অপ্রচুর সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতি বা নির্দেশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

অর্থনীতিবিদ ডিকেনসন বলেন, কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক ভাবে অর্থব্যবস্থার ব্যাপক জরীপের ভিত্তিতে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে এবং কিভাবে তা বন্টন করতে হবে সে সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

অর্থনীতিবিদ বারবারা উঁন বলেন, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার নির্বাচনকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

অধ্যাপক হায়েক এর মতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎপাদনশীল কার্যাবলির দিক নির্দেশনাই হল পরিকল্পনা।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কতগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের সম্পদের সুষ্ঠু, সঠিক, সুনির্দিষ্ট ও সচেতনভাবে ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া যেখানে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য গুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য সর্ব প্রকার উপকরণ, প্রচেষ্টা ও মূল্যবোধকে কেন্দ্রীভূত করা হয়ে থাকে। একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণ পাঁচ বছর মেয়াদী হয়। তবে প্রয়োজনে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনার গুরুত্ব

আধুনিককালে বিশ্বের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বজনীন স্বীকৃতি রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে যেসব সমস্যা থাকে সেগুলোর সমাধানের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দরকার তা কেবল পরিকল্পনার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান এবং

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করা হল:

১। প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: দেশের উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহার অপরিহার্য। এ সম্পদের একদিকে অবচয় রোধ এবং অন্যদিক সুষ্ঠু ও সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আবশ্যক পড়ে।

২। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন: সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে স্বল্প সময়ে দেশের কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নতি ঘটলে জাতীয় উৎপাদন বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান: জনসংখ্যা বিস্ফোরণের দরুন যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য জনসংখ্যাজনিত উদ্ভুত সমস্যাগুলো সমাধানে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। একমাত্র সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ছাড়া জনসংখ্যাজনিত সমস্যাগুলো সমাধান সম্ভব নয়। বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

৪। বেকার সমস্যার সমাধান: বাংলাদেশসহ অন্যান্য কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে প্রকট বেকার সমস্যা বিদ্যমান। বেকারত্ব উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। বিনিয়োগের স্বল্পতাই বেকারত্বের মূল কারণ। এ অবস্থায় দেশে পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ বাড়ালে বেকার সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব হবে।

৫। মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের স্বল্পতা বিদ্যমান। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোগ কমিয়ে ও সঞ্চয় বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করা যায়। তাছাড়া দেশের সীমিত মূলধন যথাযোগ্যভাবে বিনিয়োগ করতে হলেও পরিকল্পনার প্রয়োজন।

৬। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ: রাস্তাঘাট, সেতু, টেলিফোন, বিদ্যুতায়ন, পানি সরবরাহ, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, পার্ক ইত্যাদি অবকাঠামো ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠে না। কারণ এগুলোর নির্মাণ ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষে ও এগুলো থেকে মুনাফা তেমন আসে সা। অথচ এগুলোর অস্তিত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে এগুলো নির্মাণ করা সম্ভব।

৭। আয়ের বৈষম্য হ্রাস: অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়ানোর জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো প্রয়োজন। এজন্য আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন দরকার। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন বোধ করে জনসাধারণের মধ্যে বা কাঙ্খিতভাবে বন্টনের জন্য সম্পদের বন্টন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সুসমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।

৮। সুষম উন্নয়ন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকদের কাছে পৌছে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এজন্য দেশের প্রায় সব অঞ্চলেরই উন্নয়ন অর্থাৎ সুষম উন্নয়ন ঘটানো দরকার। একমাত্র একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

৯। লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর: রপ্তানির তুলনায় আমদানি অনেক বেশি হলে বৈদেশিক বাণিজ্য অব্যাহত প্রতিকূলতা বা ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে বিদেশের কাছে দেশের ঋণ বাড়ে। কেবল পরিকল্পিত উপায়েই রপ্তানি বাড়িয়ে ও আমদানি কমিয়ে লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব।

১০। মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস: অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান। মূলত চাহিদার তুলনায় দ্রব্য ও সেবাদির ঘাটতিই এ অবস্থার জন্য দায়ী। এ অবস্থায় একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কৃষিক্ষেত্রে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সেবার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

১১। একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ: অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবার দ্রুত গড়ে ওঠে। একচেটিয়া কারবারী বেশি দামে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে বাধাহীনভাবে জনসাধারণকে শোষণ করে। কেবল পরিকল্পিত অর্থনীতিতেই একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব রোধ এবং তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে ভোক্তাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

১২। মিশ্র অর্থনীতির বিকাশ: বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহঅবস্থান বিদ্যমান। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ দুই খাতের ভারসাম্য উন্নয়ন ঘটলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে, অপচয় রোধ করা যাবে এবং দেশে মিশ্র অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে।

১৩। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভলশীলতা হ্রাস: বিশ্বের অনেক দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতি মাত্রায় নির্ভলশীল। এ অবস্থা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ঘটালে ক্রমন্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে।

১৪। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন: দ্রুত ও অব্যাহতভাবে উন্নয়নের স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষ অর্থাৎ, দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বাড়ানো ও দামস্তরের মৃদু বৃদ্ধি দরকার। কেবল পরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনজনিত ও মুদ্রাজনিত সমস্যা এড়িয়ে দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে সচেষ্ট প্রতিটি দেশের অর্থণীতিতে পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এসব দেশে কেবল সুষ্ঠু ও কার্যকর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই স্বল্পতম সময়ে দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদের যথাযথ বন্টন ও ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

কোন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ পর্যায় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদেও মধ্যে নির্দেশভিত্তিক ও প্ররোচিত পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রিক পরিকল্পনা, বস্তুভিত্তিক ও আর্থিক পরিকল্পনা, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রধান। এখানে কেবল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে বহুমুখী লক্ষ্য ও কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত থাকে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা প্রয়োজন হয়। কোন দেশে পরিকল্পনার মেয়াদ স্বল্পকালীন না দীর্ঘকালীন হবে তা নির্ভর করে সে দেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবলি, সম্পদ প্রাপ্তি, লক্ষ্য অর্জনের কৌশল এবং উন্নয়নের স্তর প্রভৃতি বিষয়ের ওপর। এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরনের পরিকল্পনাই প্রচলিত রয়েছে।

ক. স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

যখন সুনির্দিষ্ট কতগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য স্বল্প সময়, যেমন পাঁচ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বলা যায়। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি লক্ষ্যগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য ফেলে রাখা যায় না। সামাজিক স্বার্থে এগুলো স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্জন দরকার। তাই এসব লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হল-

(ক) আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও কর্মসূজির দ্রুত বাস্তবায়ন।

(খ) মেয়াদ ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা ও বিফলতা মুল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঙ) কখনও কখনও দেশে বিরাজমান বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মত একটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(চ) পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়া সহজ ও ত্বরান্বিত করা।

খ. দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী প্রত্যাশিত চিত্র রূপকে সামনে রেখে দীর্ঘ সময় যেমন ১০, ১৫ বা ২০ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। বস্তুত একটি দেশে পরপর কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গঠন করা হয়।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা উদ্দেশ্য ও লক্ষগুলো অঙ্গ পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া যার মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ সব সময় অব্যাহত থাকে। কোন বছর বা পরিকল্পনার ব্যর্থতা অন্য বছর বা পরিকল্পনার সাফল্য দিয়ে পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মাথাপিছু আয় ও পুঁজি গঠন বৃদ্ধি, কর্মসুযোগ বাড়ানো, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মন-মানসিকতার উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মসূচির বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এ লক্ষ্যগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হল-

১. দেশের যেসব গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি ও লক্ষ্যের বাস্তবায়ন স্বল্প সময়ে সম্ভব নয়, সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ধারাবাহিকতা রক্ষা।

৩. কোন একটি পরিকল্পনার কোন ব্যর্থতা অন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে পূরণ করে সার্বিক অগ্রগতি বজায় রাখা।

৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর সাধণ করা।

৫. দেশের অর্থ ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা দূর করে উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা উন্নয়ন পরিকল্পনার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ ভালভাবে পড়বেন ও শিখবেন।

সারসংক্ষেপ

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের সম্পদের সুষ্ঠু, সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উন্নয়ন পরিকল্পনা কত প্রকার?

ক) ৩ খ) ২ গ) ৪ ঘ) ৫

২। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা কত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়?

ক) ৫ বছর খ) ১০ বছর গ) ১২ বছর ঘ) ৭ বছর

পাঠ ১০.২ উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা
Development Planning in Developing Countries

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের জন্য পরিকল্পনার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো-

ক) জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় কম এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই এ দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

খ) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন: বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার অনেক কম। দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।

গ) জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান: বর্তমানে বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ঘ) ভারী শিল্প স্থাপন: বাংলাদেশে ভারী শিল্পের অভাব রয়েছে, ফলে শিল্পোন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ঙ) মূলধন গঠন: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক কম। ফলে তাদের মূলধন গঠনের সামর্থ্য কম। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মূলধনের। একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা এটি সম্ভব।

৬) একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ: অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তরা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক মুনাফার সুযোগ থাকে না।

৭) বেকার সমস্যা সমাধান: এ দেশের হাজার হাজার লোক বেকার। কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কাজ পাচ্ছে না। সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে বেকারত্ব হ্রাস পায়।

৮) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির মাধ্যমে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন।

৯) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: এ দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তারা কখনো কখনো অনাহারে ও অর্ধহারে দিনাতিপাত করে। একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই এ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে।

১০। আয়বৈষম্য হ্রাস: বাংলাদেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের বৈষম্য দূর করে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	
শিক্ষার্থীরা উন্নয়নশীল দেশ পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় জানবেন এবং তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটা জরুরি তা অনুধাবন করবেন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নীচের কোনটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক) অনুন্নত খ) উন্নয়নশীল গ) উন্নত ঘ) অতি উন্নত

২। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে – সুযোগ থাকে না। শূন্যস্থানে কোনটি হবে?

ক) স্বাভাবিক মুনাফায় খ) অস্বাভাবিক মুনাফায় গ) ক্ষতির ঘ) কর্মসংস্থানের

পাঠ ১০.৩ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা
Experience of Development Planning in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা উদ্দেশ্য লক্ষ্য উন্নয়ন কৌশল ও খাত অনুযায়ী বন্টন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের সাফল্য মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল:

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এদেশটির অভিজ্ঞতা কম নয়। সাবেক পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালে কলম্বো পরিকল্পনার আওতায় পাকিস্তানে সর্বপ্রথম একটি ৬ষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-১৯৫৭) গৃহীত হয়। কিন্তু এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯৫৫ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করা হয়। এর পর ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ঘটলেও পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশে কোন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে তা এক অসহনীয় পৌঁছায়। এর ফলশ্রুতিতে এদেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় এবং তাদের পরিণতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পর পর কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলো হল:

(১) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)
(২) দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)
(৩) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)
(৪) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)
(৫) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই এ পরিকল্পনাগুলো প্রণীত হয়। বিদেশী সাহায্যনির্ভর এ পরিকল্পনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবুও বলা যায়, বাংলাদেশের এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। ধীরে ও অল্পহারে হলেও এদেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন তেমন না ঘটলেও সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। নিচে বাংলাদেশের উন্নয় পরিকল্পনাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় ১৯৭৩ সালে। এ পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৭৩ সালেল ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৮ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত।

পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থ সংস্থান

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-পার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪,৪৫৫ কোটি টাকা। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯% অর্থৎ ৩,৯৫২ কোটি টাকা সরকারি খাতে এবং ১১% অর্থাৎ ৫০৩ কোটি টাকা বেসরকারি খাতে ব্যয় ধরা হয়। কাজেই এ পরিকল্পনার সরকারি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছি।

পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ২,৬৯৮ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ১,৭৫৭ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে আসবে বলে ধরা হয়েছি। অর্থাৎ পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ ও শতকরা ৪০ ভাগ বৈদেশিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রথম পঞ্চপার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় এ চার মূলনীতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্ন হতে মুক্তি এবয় যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষগুলো নির্ধারিত হয়ঃ

১। জনগণের দারিদ্র্য লাঘব করা।

২। পুনর্গঠন কাজ অব্যাহত রেখে তা সমাপ্ত করা এবং অর্থনীতির প্রধনা খাত কৃষি ও শিল্পের অবস্থা দ্রুত ১৯৬৯-৭০ সালের সময়ের পর্যায়ে উন্নীত করা।

৩। মোট জাতীয় উৎপাদন (G.D.P) গড়ে বার্ষিক ৫.৫% হারে বাড়ানো।

৪। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তৈল, কেরোসিন, চিনি ইত্যাদি উৎপাদন বাড়ানো।

৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের উর্ধ্বগতি রোধ করে স্থিতিশীল করা।

৬। মাথাপিছু আয় গড়পড়তা বার্ষিক ২.৫% হারে বাড়বে।

৭। ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৮। দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে পরিকল্পনাকালে সেগুলোকে আরও সুসংহত করা।

৯। জনসংখ্যা বাড়ার হার রোধ করা। এজন্য পরিবার পরিকল্পনার কার্যকারিতা বাড়ানো এবং জন্মহার ৩% থেকে বার্ষিক ২.৮% এ নামিয়ে আনা।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু তা না করে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ এ দু বছরের জন্য একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় প্রথম পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো শেষ করা, প্রথম পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভবনা যাচাই প্রভৃতির জন্য দুৎবছর মেয়াদী একটি অন্তর্বতীকালীন পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল।

ক. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থসংস্থান

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পানর মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩.৮৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যয় বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩,২৬১ কোটি টাকা ও ৬০০ কোটি। অর্থাৎ, মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে সরকারি খাতের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৮৩ ভাগ এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ শতকরা ১৭ভাগ। পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান ধরা হয় ১,৩০৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য ২,২৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ দেশীয় সম্পদ হতে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে বলে ধরা হয়। অবশিষ্ট যে ২৬১ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দেবে তা দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ ও অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে পূরণ করার কথা ছিল।

খ. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। উন্নয়নের হার বাড়ানো

২। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানো

৩। বৈদেশিক সাহায্যেও ওপর নির্ভরতা কমানো।

৪। আয়ের সুষম বন্টন

৫। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা

৬। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

৭। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও উপকরণের যোগাদন বাড়ান প্রভৃতি।

গ. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্র নির্ধারিত হয়েছিলঃ

১। প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক ৫.৬% হারে এবং বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২.৪% হারে বাড়ানো।

২। কৃষি-উৎপাদন বার্ষিক ৪.১% হারে বাড়ানো।

৩। শিল্পোন্নয়নের হার বার্ষিক ৭.৩% হারে বাড়ানো।

৪। বার্ষিক গড় সঞ্চয়ের হার মোট উৎপাদনের ২.৬% ভাগ থেকে পরিকল্পনা শেষে ৫.৭% ভাগে উন্নীত করা।

৫। বিদেশী সাহায্যেও ওপর নির্ভরশীলতা প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরের শতকরা ৭৭ ভাগ থেকে কমিয়ে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে শতকরা ৬৪ ভাগ আনয়ন করা হয়।

৬। রপ্তানি আয় বার্ষিক শতকরা ১১ ভাগ হারে বাড়ানো।

৭। পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ২৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮। পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৭৯-৮০) খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৪৪ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত করা। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি বছরে ১৭ লক্ষ মেঃটন থেকে ১৩ লক্ষ মেঃ টন কমিনে আনা।

৯। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সম্প্রসারণের হার শতকরা ১৬ ভাগ বাড়ান।

১০। পরিকল্পনা আমনে অতিরিক্ত ৫০০ গ্রামে বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা।

১১। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের সুযোগ বাড়ান। অতিরিক্ত ১৫০০ হাসপাতাল বিছানা এবং অতিরিক্ত ১৮০টি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করা।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর ১৯৮০ সালের জুলাই মাস থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। পরিকল্পনার আয়তন ছিল ২৫,৫৯৫ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২০,২১৫ কোটি টাকা ও ৫,৪৭৫ কোটি টাকা। কিন্তু দেশে আর্থিক সম্পদ সংস্থানের হার আশানুরূপ না হওয়ায় এবং বৈদেশিক সাহায্যেও পরিমাণ কমে যাওয়ায় পরবর্তীকালে পরিকল্পনার আয়তন ও ব্যয় বরাদ্দ পুনঃনির্ধারিত হয়।

ক. সংশোধিত পরিকল্পনা আয়তন

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত পরিকল্পনার মোট ব্যয় ১৭,২০০ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি খাতে ১১,১০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ৬,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে দেশীয় সম্পদ থেকে ৯,৫০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ বাবদ ৭,৭০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়। পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার হার ছিল শতকরা ৫৮ ভাগ।

খ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

সংশোধিত দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিম করা।

২। গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩। শ্রমশক্তি উন্নয়ন ও শ্রমের যোগানের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো।

৪। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উল্লেখযোগ্যভাবে জনসম্পদের উন্নতি সাধন।

৫। মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ৫.৪ ভাগ হারে বাড়ানো।

৬। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ২.৮০ হতে ২.২৩-এ।

৭। অধিক হারে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

৮। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আয়, সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন সাধন করা।

৯। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১.৭৫ কোটি মেঃ টন।

১০। মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে বাড়ানো।

১১। কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ৫.০ ভাগ এবং শিল্পখাতে বার্ষিক শতকরা ৮.৪ ভাগ ধরা হয়।

১২। ১৯৮০-৮৫ সাল নাগাদ জাতীয় সঞ্চয় মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৭.১৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়।

গ. দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দ

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনয় কৃষি খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এ ব্যয় বরাদ্দ (৬,০৫৯ কোটি টাকা) মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। এরপর শিল্পখাতে বরাদ্দ করা হয় ৩০৬৯ কোটি টাকা যা ছিল পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ২৫১০ কোটি টাকা যা ছিল মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগ।

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ কাল ছিল ১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন। এ পরিকল্পনার আয়তন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ, খাতওয়ারী বরাদ্দ ও মূল্যায়ন নিচে আলোচনা করা হলঃ

ক. পরিকল্পনার আয়তন

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মোট ৩৮,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ২৫,০০০ কোটি টাকা বা ৬৫% সরকারি খাতে এবং ১৩,৬০০ কোটি টাকা বা ৩৫% বেসরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়। মোট ব্যয়ের মধ্যে ১৭,৫৭২ কোটি টাকা অভ্যন্তরীন সম্পদ হতে সরকারি সঞ্চয় ৫,৯৬০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি সঞ্চয় ১১,৬১২ কোটি টাকা এবং ২১,০২৮ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে সংগ্রহ করা হবে বলে ধরা হয়। এ পরিকল্পনায় বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভশীলতার হার ধরা হয় ৫৪.৫ শতাংশ। এ পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান নিচে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় দেখান হলঃ

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অর্থসংস্থান (কোটি টাকায়)

উৎস	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত
১. অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭,৫৭২	৫,৯৬০	১১,৬১২
২. বৈদেশিক সাহায্য (নিট)	২১,০২৮	১৯,০৪০	১,৯৮৮
মোটঃ	৩৮,৬০০	২৫,০০০	১৩,৬০০

খ. তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করা হলঃ

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ।

২। উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ

৩। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

৪। অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের নিমিত্তে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন।

৫। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৬। সাধারণ জনগোষ্ঠির নিম্নতম মৌলিক চাহিদা পূরণ

৭। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং

৮। অধিকতর স্বনির্ভরতা অর্জন।

উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনার নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়:

১। পরিকল্পনার মেয়াদকালে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধিও হার নির্ধারণ করা হয় ৫.৪ শতাংশ।

২। ১৯৮৯-৯০ সালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধিও হার কৃষি হাতে ৪%, শিল্প খাতে ১০.১%, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে ৯.৬% নির্মাণ খাতে ৪.৯% পরিবহন খাতে ৬.৯% এবং অন্যান্য খাতে ৫.৮% অর্জিত হবে বলে আশা করা হয়।

৩। ১৯৮৯-৯০ সালে ২.০৭ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

৪। পরিকল্পনাকালে ৫১ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পরিকল্পনাশেষে মোট ২৪৪ লক্ষ লোকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে আমা করা হয়।

৫। ১৯৯০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হার ১.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে বলে অনুমান করা হয়।

৬। পরিকল্পনাশেষে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করার আশা ব্যক্ত করা হয়।

৭। পরিকল্পনা শেষ বছরে জাতীয় আয়ে করের অংশ ১০.৩% হবে বলে ধারণা করা হয়।

৮। পরিকল্পনা মেয়াদ রপ্তানির পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫.৯ ভাগ হারে বাড়বে বলে ধরা হয়।

গ. তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দ

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসকারি খাতে যথাক্রমে ২৫,০০০ কোটি এবং ১৩,৬০০ কোটি মোট ৩৮,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দ কবিবেচনা করতে গিয়ে বলা যায়, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ ১১,৪৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় যা ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। বেশি ব্যয় বরাদ্দের অন্যান্য খাতের অবস্থা ছিল শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ১৬% ভাগ, শিল্প ও খনিজ প্রায় ১৫% ভাগ পরিবহন ও যোগাযোগ প্রায় ১২% ভাগ, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ প্রায় ১১% ভাগ।

ঘ. তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর উন্নয়ন কৌশল

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাফল্য কেবল আর্থিক বিনিয়োগের ওপরই নির্ভর করে না, বরং সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতি ও সঠিক কৌশল প্রভৃতির ওপর তা নির্ভরশীল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে উন্নয়ন নির্ধারিত হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপঃ

১। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন: পরিকল্পনা শেষে ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০৭ লক্ষ মেঃ টন। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য নির্ধারিত কৌশল ছিল আধুনিক সেব সার বীজ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, বোরো ও গম উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান এবং শীতকালীন চাষের জন্য পানি বর্ধিত ব্যবহার।

২। অপ্রধান শস্যের উৎপাদন: গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সীমিত জমি ও পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের কথা বলা হয়। কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটি সুষ্ঠু শস্য উৎপাদন নীতিও গ্রহণ করা হয়।

৩। পাট উৎপাদন: তৃতীয় পরিকল্পনায় পাটের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য উন্নত বীজ সরবরাহ করার কথা বলা হয়। পাটের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের কৌশল গৃহীত হয়।

৪। গবাদি পশু ও মৎস্য উন্নয়ন: পরিকল্পনাকালে গবাদি পশু সম্পদ বাড়ানোর জন্য পশুপালন খামারের উন্নয়ন, পশু প্রজনন, চিকিৎসা ও পশুখাদ্য সরবরাহে উন্নতি সাধন করা হবে বলে ধরা হয়। বলা হয় এতে ভূমিহীন কৃষকদেও কর্মসুযোগ বাড়বে। গ্রামীণ পুকুরে মৎস্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করার কৌশল গৃহীত হয়।

৫। বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ তফসিল: পরিকল্পনা শিল্প খাতে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিল্প বিনিয়োগ তফসিলকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত ও নমনীয় করা হয়। ছোট শিল্পগুলোকে বড় ও মাঝারি প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার যথাযথ নীতিও গৃহীত হয়।

৬। জ্বালানি সম্পদের উন্নয়ন: গ্যাসের উত্তোলন ও বন্টন প্রক্রিয়া এবং দেশের পশ্চিমাংশে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার কথা বলা হয়। এ খাতে অন্যান্য কৌশল ছিল- গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি, মুক্ত বন উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস কমান এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশী কোম্পানিকে আকৃষ্ট করা।

৭। পরিবহন ও যোগাযোগঃ পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ভৌত সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৮। শিক্ষাঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষা উন্নয়নের জন্য স্থিরকৃত কৌশলগুলো ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কর্তৃত্বস্থানীয় সরকারের ওপর অর্পণ, প্রাথমিক স্তরে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মাঝপথে স্কুল ত্যাগের হার কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ, ছোট ছোট এলাকায় স্কুল স্থাপন, শিক্ষা উন্নয়নের সমাজের গোষ্ঠীগত সংশ্লিষ্টতা অর্জন প্রভৃতি।

৯। স্বাস্থ্যঃ ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সুবিধার প্রসার এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও পুষ্টি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়।

১০। জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনাঃ পরিবার পরিকল্পনার বর্ধিত সাফল্যের জন্য মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সমাজ সচেবনতা বাড়ান অপরিহার্য। সেজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাকে শুধু বিবাহিত সম্পতির সমস্যা হিসেবে না দেকে এতে কমিউনিটির অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়।

১১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজনীয় সমাবেশ ঘটানোর জন্য কিছু কৌশল গৃহীত হয়। এগুলো ছিল জাতীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবহার দ্বারা সরকারি ভোগ কমানো, ভর্তুকি কমানো, কর প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ান এবং কর-কাঠামো যুক্তিসঙ্গত করা, সরকারি উপযোগ এবং সরকারি খাতের দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ান প্রভৃতি।

১২। কর্মসংস্থানঃ নিয়োগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার গৃহীত কৌশলগুলো ছিল কৃষির পাশাপাশি কৃটির শিল্পে কারিগরি উন্নতির মাধ্যমে শ্রম নিয়োগ বাড়ান, মৎস্য, হাঁস মুরগি ও পশু পালন, বন ও গ্রামীণ শিল্প প্রভৃতি খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি। তাছাড়া কৃষি বহির্ভূত খাতে কর্ম সুযোগ বাড়ানোর জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপরও জোড় দেয়া হয়।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন শেষ হয়। মূলত কাঠামোগত ত্রুটির জন্য এ পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যই অর্জিত হয়নি। তাই অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৯০-২০১০ সালে পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ বিশসালা প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। ১৯৯০ সালেল ১লা জুলাই থেকে এ পরিকল্পনা শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালের ৩০শে জুন এর মেয়াদ শেষ হয়।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আয়তন ও অর্থসংস্থান

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পডনার সংশোধিত পর্যায়ে আয়তন নির্ধারণ করা হয় ৬২,০০০ কোটি টাকা, এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিশাণ যথাক্রমে ৩৪,৭০০ ও ২৭,৩০০ কোটি টাকা। সংশোধিত মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ৩৪,৫৫০ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ২৭,৪৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে সংগৃহীত হবে বলে ধরা হয়। পরিকল্পনার প্রাক্কলিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার হার ছিল শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

দেশের বিশসালা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (১৯৯০-২০১০) এর সাথে সঙ্গতি রেখে চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রণীত হয়। এ পরিকল্পনার উদ্দেশগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছিল নিন্মরূপ

২। জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হার কমান।

৩। ক্রমবর্ধমান দারিদ্রায়ন রোধ এবং জনসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংষ্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

৪। দেশজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান বাড়ান।

৫। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৬। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা এবং ক্ষুদ্র ও দুটির শিল্পের সম্পসারণ ঘটান।

৮। শিল্প খাতকে রপ্তানিমুখী করে তোলা।

৯। দেশীয় প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর পরিবর্তন আনয়ন।

১০। দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১২। আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে খাল খনন, বনায়ন, শাক সবজি ও ফলমূল চাষ ও হাঁস মুরগির খামার, মৌমাছির চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় তা ছিল নিম্নরূপ:

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা

খাত	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)
১। মোট দেশজ উৎপাদন	৫.০০
২। কৃষি	৩.৪২
৩। শিল্প	৯.০২
৪। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৯.২৮
৫। নির্মাণ	৫.৮৬
৬। যোগাযোগ ও পরিবহন	৫.৩৯
৭। বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা	৫.০০
৮। গৃহায়ন	৩.৬২
৯। সরকারি সেবা	১০.৬৫

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গনি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশর চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এ প্রেক্ষাপটেই এর খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনায় যেসব খাতে বেশি ব্যয় বরাদ্দ করা হয় সেগুলো ছিল কৃষি, পানি সম্পদ ও গ্রামোন্নয়নে প্রায় ২৭% ভাগ, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রায় ১৫% ভাগ, শিল্প প্রায় ১৩% ভাগ, বিদ্যুৎ, তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ১২% ভাগ, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহনির্মাণ ও পানি সরবরাহ প্রায় ১১% ভাগ।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উন্নয়ন কৌশল

মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য মোচন এবং দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও পতিবন্ধকগুলো দূর করা, অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়ানো ইত্যাদি ছিল চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

১। খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে গোষ্ঠীভিত্তিক পরিকল্পনা সমন্বয় সাধনঃ পরিকল্পা নির্মাণের কলাকৌশলের দিক থেকে চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক খাত ও সামাজকি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেয়া হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে পল্লী ও শহর এলাকায় ভাগ করা হয়। পল্লী এলাকার কর্মকান্ডকে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য কর্মকান্ডে ভাগ করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক হনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত। শহর এলাকার সকলেই অবশ্য কৃষি-বহির্ভূত কর্মকান্ডে লিপ্ত বলে ধরা হয়। শহর এলাকায় যারা দরিদ্র, তারা অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত। দেশের জনসাধারণকে এভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে ভাগ করার ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠিত উন্নয়নের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার তা ঠিক করা যাবে বলে মনে করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের ফলে কোন গোষ্ঠী উপকৃত হবে তা নির্ধারণ করা যাবে বলে মনে করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা(১৯৯৭-২০০২)

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সাধন করা।

২) মোট দেশজ উৎপাদন গড়ে বার্ষিক ৭% হারে প্রবৃদ্ধির অর্জন।

৩) মাথাপিছু আয় গড়ে বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা।

৪) শ্রমঘন ও পুঁজিঘন প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫) স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সাধন করা।

৬) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং অধিক মুল্য সংযোগকারী রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কর।

৭) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জন বিশেষ করে বেসকারি খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবাখাতের উন্নয়ন সাধন করা।

৮) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন করে।

৯) প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা ও জন্মশাসনের মাধ্যমে বৃদ্ধির হার হ্রাস করে পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে ১.২ শতাংশে নামিয়ে আনা।

১০) ইলেকট্রনিক্স ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংসহ নব প্রজন্মের বিভিন্ন প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান পূর্বক দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত করা।

১১) পরিকল্পনাকালে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারীর অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে তোলা।

১২) গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং উৎপাদনমূখী করা।

১৩) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী-পুরুষের ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

১৪) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-

দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, যা দুটি সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করা হবে।

- ❖ প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ❖ দ্বিতীয়টি হচ্ছে বণ্টনব্যবস্থার ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ।
- ❖ গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি এবং কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এই কৌশলের মূল উপাদান।
- ❖ কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈচিত্য আনয়ন ও এই খাতের বাণিজ্যিকরণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং যারা কৃষিখাতে থাকবে, তাদের উচ্চ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।
- ❖ এই পরিকল্পনায় দেশজ বিনিয়োগ কর্মসূচী (সিআইপি) বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ❖ এই পরিকল্পনায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ সুসমন্তিত করা হয়েছে।
- ❖ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা হবে এবং একই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পুরজ্জীবিত করা হবে।
- ❖ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কৌশলগত একটি উপাদান হচ্ছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে করে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত হতে পারে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহের নারীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হবে।
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পদ্ধতিগতভাবে জলবায়ু সহনশীল দক্ষতার উন্নয়ন করা হবে এবং দুর্যোগব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করা হবে।
- ❖ সীমিত বৃমিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গ্রহণ করা হবে।
- ❖ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তথা ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইট) খাতের উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ কর।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্ত সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ❖ একটি ধর্মনিরপেক্ষ সহনশীল উদার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা;
- ❖ সুশাসন বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস;
- ❖ টেকসই মানবউন্নয়ন;
- ❖ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস;
- ❖ একটি দূরদর্শী সামষ্ট্রিক অর্থনৈতিক নীতি কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- ❖ সহায়ক শিল্প ও বাণিজ্যনীতি ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- ❖ বৈশ্বিককরণ ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বা বাধাগুলো মোকাবিলা করা;
- ❖ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ❖ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন;
- ❖ পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা সহজলভ্য করা;
- ❖ পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ;
- ❖ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা: দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য হ্রাসের একটি অত্যাবশকীয় পূর্বশর্ত হলো উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য টেকসই উৎপাদনশীল কমৃসংস্থা ও আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বসচেয়ে কার্যকর উপায়। এ জন্য শ্রমবাজারে চাহিদা মোতাবেক কৌশল ও পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সরবরাহের দিক থেকেও কর্মকৌশল ও নীতিমালা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের হার বর্তমান জিডিপির ২৪.৪ শতাংশ থেকে উল্লেখ যোগ্যভাবে বাড়াতে হবে। বিদেশে কর্মসংস্থান এবং রেমিট্যান্স বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

- ❖ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উপাদানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা: ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি ও পরিবেশসহ উৎপাদনের সব ক্ষেত্রে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জোরালো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে সহায়ক নীতিমালার মধ্যে যথাযথ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইটি) ব্যবহারের বিষয়টিও রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটি মূল ভাবনা হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন যেখানে আইসিটি নীতিমালার রূপকল্প ও মূলনীতিগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়েছে।
- ❖ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করা: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস করার ব্যাপারে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার ব্যাপারে অতীতে অগ্রগতি অর্জন সত্ত্বেও

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা আগে কমিয়ে আনার ব্যাপারে নতুন করে জোর প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল মেয়েদের শিক্ষা, নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেবা এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

- ❖ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সামর্থ রাখে। সঠিকভাবে উৎসাহিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে খাদ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এ জন্য কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলকে কাজে লাগানোর বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জাতীয় খাদ্যনীতি ও কর্মপরিকল্পনা এবং দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১০-১৫ এর সহায়তা নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তার ত্রৈমাত্রিক বিষয় সহজলভ্যতা, প্রবেশাধিকার ও উপযুক্ত ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাত অনুযায়ী বণ্টনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী বণ্টনের সারসংক্ষেপ:

- ❖ পরিকল্পনার মেয়াদ, পাঁচ বছর (২০১-১১ থেকে ২০১৪-১৫):
- ❖ মোট বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)- ১৩,৪৬৯.৪
- ❖ সরকারি খাতে বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)-৩,০৭৫.৮
- ❖ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)-১০,৩৯৩.৬
- ❖ দেশজ উৎস (মোট) (বিলিয়ন টাকা)- ১২,২১৫.৩
- ❖ দেশজ উৎসের অংশ(%)- ৯০.৭;
- ❖ বিদেশি উৎস (নিট)- ১,২৫৪.১;
- ❖ বিদেশি উৎসের অংশ(%)-৯.৩;
- ❖ দেশজ সম্পদ বেসরকারি খাত (বিলিয়ন টাকা)- ৯,৯৭৫;
- ❖ বৈদেশিক সম্পদ সরকারি খাতে (বিলিয়ন টাকা)- ৮৩৬.২;
- ❖ বৈদেশিক সম্পদ বেসরকারি খাত(বিলিয়ন টাকা)- ৮১৭.৯;

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা:

সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার প্রভাবে বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে প্রাপ্ত সম্পদেরদ দ্বারাও দরিদ্রতার গতি খর্ব করা সম্ভব।

বাংলাদেশে চক্রাকারে ক্রিয়াশীল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিমালা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন। স্বল্পমেয়াদি ও বিচ্ছিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রতার গতিরোধ করা আদৌ সম্ভব নয়। বাংলাদেশে বিরাজমান দরিদ্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সুপারিশমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১) **সামাজিক জরিপ ও গবেষণা:** দরিদ্রতার কারণ, প্রকৃতির প্রভাব, ব্যাপকতা প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক ও বাস্তব তথ্য সংগ্রহের জন্য যেমন প্রয়োজন ধারাবাহিক জরিপ এবং গবেষণা পরিচালনা করা, তেমনি প্রয়োজন দরিদ্রতা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা। তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ব্যতীত দরিদ্রতার ন্যায় জটিল ও সর্বগ্রাসী সমস্যার মোকাবিলা আশা করা যায় না।

২) **সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতি প্রণয়ন:** আর্থ-সামাজিক জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দরিদ্রতা হ্রাসের সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উপযুক্ত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করা। সুনির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন ব্যতীত এর গতি খর্ব করা সম্ভব নয়।

৩) **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:** জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশে দারিদ্র্যতার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যঅ বৃদ্ধি রোধকল্পে প্রচলিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে অধিক গণমুখি ও কার্যকরি করে তোলে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বাংলাদেশের গণদারিদ্রতা দূরীকরণ আদৌ সম্ভব নয়।

৪) **কৃষি উন্নয়নঃ** বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের প্রধান খাত হচ্ছে কৃষি। উন্নয়নের জন্য লাগসই 'বীজ, সার, সেচ, কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নতর চাষাবাদ পদ্ধতি, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বহুমূখী কৃষি উৎপাদন, ভূমির খন্ড-বিখন্ডতা দূরীকরণ, প্রচলিত ভূমিস্বত্ব প্রথার সংস্কার প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

৫) **শিল্পায়নঃ** বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অবদান শতকরা মাত্র ২৮.৭৭ ভাগ (২০১৬)। বিশ্বের কোনো দেশেই শিল্পখাতের অবদান এত কম নেই। শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান, উপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং লাগসই প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র দূরীকরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কৃষিনির্ভর শিল্পায়ন ব্যতীত দরিদ্র-হ্রাস করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

৬) **শিক্ষার উন্নয়নঃ** শিক্ষিত জনশক্তি সচেতন এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা দূর করে বাস্তবমুখি দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলে। শিক্ষাই হচ্ছে দরিদ্র সমস্যা মোকাবিলা করার উত্তম হাতিয়ার।

৭) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণঃ** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় এবং সহায় সম্পদ হারিয়ে নি:স্ব হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে আকস্মিক দুর্যোগের ফলে জনগণ দু:স্থ ও অসহায় না হয়ে পড়ে।

৮) **কুটির শিল্পের উন্নয়নঃ** গ্রামীন দক্ষ-অদক্ষ কারিগরদের সংগঠিত করে স্থানীয় কাঁচামাল ও চাহিদানির্ভর কুটির শিল্প স্থাপন করে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টিতে গৃহকেন্দ্রিক কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

৯) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনঃ** বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং এরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গ্রামভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোনো কর্মসূচি বাংলাদেশে আজও গড়ে উঠেনি। গ্রামীণ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে দরিদ্রতার গতি অনেকাংশে রোধ করা যাবে।

১০) **সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণঃ** বাংলাদেশের গণদারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সম্পদ ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন। সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণদারিদ্র বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। প্রাপ্ত সম্পদের উপর দরিদ্রতম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত তাদের সুষম উন্নয়ন আশা করা যায় না।

১১) **গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলাঃ** সমবায়কে দরিদ্রদের নিজস্ব কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নয়নের শ্লোগান হচ্ছে "উন্নয়নে সমবায়ের বিকল্প নাই।" সমবায়ের ত্রুটি ও সমস্যাবলি দূর করে একে অধিক গণমূখী করে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ সমবায়কে উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারে।

১২) **গণমূখী প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টিঃ** গণদারিদ্র দূরীকরণের তথা পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে নির্দিষ্ট খাতে যথাযতভাবে ব্যয় করা হয়, তার জন্য উপযুক্ত দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা। কারণ, বাংলাদেশে দরিদ্রতা সম্প্রসারণের জন্য প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্বলতা অন্যতম কারণ।

১৩) **কর্মহীন মৌসুমে পল্লী অবকাঠামো নির্মাণঃ** কর্মহীন মৌসুমে পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসূচী (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী) বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে কর্মহীন অবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণি ঋণগ্রস্ত হয়ে আরো দরিদ্র না হয়ে পড়ে।

১৪) **প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সহজলভ্যতাঃ** দরিদ্র শ্রেণির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মূলধন ও কর্মসংস্থানের অভাব। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থা চালু থাকলেও প্রকৃত দরিদ্রের হাতে তা পড়ছে না। কেননা ঋণ প্রাপ্তির শর্ত পূরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ও অন্যান্য খাতে ঋণ প্রদানের জটিলতা দূর করে দরিদ্র কৃষকদের নিকট সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা। যাতে গ্রামীণ মহাজনদের উচ্চ সুদের ঋণ গ্রহণের হাত থেকে দরিদ্র জনগণ মুক্তি পায়।

১৫) **স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণঃ** বাংলাদেশে অসংখ্য বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি সাহায্যপুষ্ট দেশিয় সংস্থা দরিদ্রতা দূরীকরণের নিয়োজিত। এসব দেশি-বিদেশি সংস্থার কল্যাণমূলক কার্যাবলি নিয়মিতভাবে চলা সত্ত্বেও দরিদ্র্য, হতাশা ও বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী

প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায়, কিভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে, তার যথাযথ তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬) **দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করা:** দরিদ্রদের সংগঠিত শক্তি ও ক্ষমতাই দরিদ্রতা দূরীকরণের অন্যতম উপায়। সুতরাং ছোট ছোট স্বনির্ভর প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে তোলে।

দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ:

বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে নিচে তাদের কয়েটি আলোচনা করা হলো:

১) **সামাজিক নিরাপত্তা:** টেকসই দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদার প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকার-২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের কাজ চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দুস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠির ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখা, পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের ঘূর্ণায়মান গতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

২) **নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম:** বয়স্ক ভাতা,এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৩) **খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি:** কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, টিআর ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে প্রচেষ্টা চালানো।

৪) **একটি বাড়ি একটি খামার:** সরকার প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৫) **নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ:** এ প্রকল্পের আওতায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং নারীকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৬) **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম:** পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছে। এতে দারিদ্র ও চরম দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫তে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাভূক্ত কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৭) **সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি:** এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গ্রামের সবশ্রেণির ও পেশার জনগোষ্ঠীকে একক সমবায় সংগঠনের আওতায় এনে তাদের আর্থসামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	
শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা সহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করবেন এবং সাথে সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে যেসব ব্যবস্থা এদেশে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছিল কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াসে। এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কোন্‌টি?

ক) ১৯৭১-৭৬ খ) ১৯৭২-৭৭ গ) ১৯৭৩-৭৮ ঘ) ১৯৭৪-৭৯

২। বাংলাদেশে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কোন্‌টি?

ক) ১৯৭৮-৮০ খ) ১৯৮০-৮২ গ) ১৯৭৪-৭৬ ঘ) ১৯৭৬-৭৮

৩। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি-তে শিল্পের অবদান কত?

ক) ২৮.৭৭ ভাগ খ) ৮৬ ভাগ গ) ৬৫ ভাগ ঘ) ২৯ ভাগ

৪। বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ কোনটি?

ক) ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ খ) ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪

গ) ২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ ঘ) ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে ২৫ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনাটি কী ধরনের

ক) জাতীয় খ) প্রেক্ষিত গ) আঞ্চলিক ঘ) বিকেন্দ্রীয়

৬। এ ধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য–

i. জনগনের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি

ii. কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন

iii. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১০.৪ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন- ২০২১
Sustainable Development Goals and Vision 2021

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভিশন-২০২১ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা:

টেকসই উন্নয়ন হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং "টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ১৯৩টি দেশ নিম্নোক্ত ১৭ লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একমত হয়েছে:

১। **দারিদ্র বিমোচন:** সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র নির্মুল করা।

২। **ক্ষুধা মুক্তি :** ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।

৩। **সুস্বাস্থ্য :** স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।

৪। **মানসম্মত শিক্ষা :** অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

৫। **লিঙ্গ সমতা :** লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।

৬। **সুপেয় পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা :** সবার জন্য পানি ও পয়:নিষ্কাশনের সহজ প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৭। **নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী :** সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।

৮। **কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি :** সবার জন্য দীর্ঘমেযাদী, অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পুর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯। **উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো :** দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।

১০। **বৈষম্য হ্রাস :** দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।

১১। **টেকসই নগর ও সম্প্রদায় :** নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলে।

১২। **সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার :** টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা।

১৩। **জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ :** জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪। **টেকসই মহাসাগর :** টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সাদুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।

১৫। **ভূমির টেকসই ব্যবহার :** পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্রের ক্ষতি রোধ করা।

১৬। **শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান:** টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৭। **টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব:** বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

ভিশন ২০২১

২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। ভিশন ২০২১ প্রস্তুতির উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে বাংলাদেশের একটি কাঠামো উপস্থাপন করার চেষ্টা করা, যা অর্থনৈতিকভাবে সমেত এবং দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে। এখানে কয়েকটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে আটটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়। এই আটটি লক্ষ্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটির এক বছরের কর্মকান্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিল (সিপিডি)। এই ডকুমেন্টটি নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি ব্যক্ত করে যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও ন্যায় পরায়নতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসনের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ।

ভিশন-২০২১ কতগুলো দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে গঠিত হয়েছে। এটি ২০১০-২০২১ সালের মধ্যে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান দুটি লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে:

১। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন
২। শিল্পোন্নয়ন
৩। রপ্তানী বৃদ্ধি
৪। বাণিজ্য নীতি যুগোপযোগী করা

৫। বিশ্বায়ন থেকে সুযোগ গ্রহণ
৬। বৈদেশিক বিনিয়োগ
৭। বাণিজ্য বহুমুখীকরণ
৮। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
৯। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া
১০। জ্বালানী শক্তি নিরাপত্তা
১১। পরিবহন ও যোগাযোগ
১২। মানব সম্পদ উন্নয়ন
১৩। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ
১৪। সামাজিক সংরক্ষণ
১৫। টেকসই উন্নয়ন।

ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ:

১। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা;
২। একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
৩। দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া;
৪। সুস্থ্য নাগরিকদের একটি জাতি গঠন করা;
৫। একটি দক্ষ ও সৃজনশীল মানব সম্পদের বিকাশ করা;
৬। একটি বিশ্বব্যাপী সমন্বিত আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক হাব তৈরি করা;
৭। পরিবেশগতভাবে টেকসই হওয়া;
৮। একটি সমবায়ী ও ন্যায়বান সমাজ গড়া।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা টেকসই উন্নয়ন কি জানবেন এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো বিষয়ে পড়াশোনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। এখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় কতটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে?
ক) ১৮ খ) ১৭ গ) ২০ ঘ) ১৫

২। কতটি দেশ টেকসই লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে একমত হয়েছে?
ক) ১৯০ খ) ১৯২ গ) ১৯৩ ঘ) ১৮৮

৩। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কতসালে শেষ হয়?
ক) ২০০০ খ) ২০১৫ গ) ২০১০ ঘ) ২০১৪

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আরিফুল ইসলাম অর্থনীতি ক্লাসে বললেন, দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়। তবে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনার সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়নের উপর।
ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা কি?
খ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?
গ) উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকার "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের জন্য ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে এটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ইতোমধ্যেই সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার গৌরব অর্জন করেছে।
ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা কি?
খ) দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত "ভিশন-২০২১" কোন ধরনের পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১০.১: ১। খ ২। ক
পাঠ ১০.২: ১। খ ২। খ
পাঠ ১০.৩: ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ক ৫। খ ৬। ঘ
পাঠ ১০.৪: ১। খ ২। খ ৩। গ